বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন রহিতক্রমে সংশোধিত আকারে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল সংক্রান্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৭ নং আইন) রহিতক্রমে সংশোধিত আকারে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ—

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা
৪। কাউন্সিলের কার্যালয়
৫। কাউন্সিলের পরিচালনা ও প্রশাসন
৬। গভর্নিং বডি
৭। সদস্যপদের মেয়াদ
৮। সদস্যপদের অবসান
৯। কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
১০। গভর্নিং বডির সভা
১১। নির্বাহী পরিষদ
১২। নির্বাহী পরিষদের সভা
১৩। নির্বাহী চেয়ারম্যান
১৪। সচিবালয়, ইত্যাদি
১৫। সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইত্যাদি
১৬। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের জনবল
১৭। তহবিল
১৮। বাজেট
১৯। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা
২০। বার্ষিক প্রতিবেদন
২১। কমিটি
২২। ক্ষমতা অর্পণ
২৩। তফসিল সংশোধন

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
২৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
২৬। গভর্নিং বডি, নির্বাহী পরিষদের সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জনসেবক
২৭। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
২৮। কতিপয় আইনের অপ্রযোজ্যতা
২৯। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ
৩০। রহিতকরণ ও হেফাজত
তফসিল

সেচ

•

সেচ (Irrigation) বাঁধ, নালা, খাল ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক উপায়ে শুকনো ক্ষেত-খামারে পানি সরবরাহ। সেচ কার্যক্রম এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বহু হাজার বছর পূর্ব থেকেই চালু হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, বিশেষ করে যেসব এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০০ মিমি-এর কম। মাটির আর্দ্রতা যথেষ্ট বেশি থাকলেও কোন কোন ফসলের জন্য, যেমন রোপা আমন, অতিরিক্ত পানির প্রয়োজন হয়। এক হিসাবে জানা যায় যে, সারা পৃথিবীতে সেচকৃত মোট জমির পরিমাণ ২১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৪৯ হাজার হেক্টর থেকে ২৫ কোটি হেক্টর; এর প্রায়

অর্ধেক জমি ভারত, পাকিস্তান, চীন এবং বাংলাদেশে। সম্ভবত পানির বিতরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং মজুতের জন্য খাল, নালা, বাঁধ, সংরক্ষিত জলাধার ইত্যাদির প্রথম প্রচলন হয়েছিল প্রাচীন মিশরে। আধুনিককালে ভূগর্ভস্থ এবং মাটির উপরিভাগের পানির উৎস থেকে সেচ কাজের জন্য সেচপাম্প চালু হয়েছে।

বাংলাদেশে ফসলের জমিতে সেচের জন্য গভীর ও অগভীর উভয় ধরনের নলকূপ এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে (নভেম্বর-মার্চ)। ধানের উন্নত জাতগুলি খরার প্রতি অতি সংবেদনশীল হওয়ার কারণে এ শস্যে মাঝে মধ্যেই সেচের প্রয়োজন হয়। ২০০৬-০৭ সালে ৫৫,০১,৪২৮ হেক্টর জমি সেচের আওতাধীন ছিল।

সেচ সরঞ্জাম চাষ ও গৃহকাজের জন্য ভূপৃষ্ঠের বা ভূগর্ভের উৎস থেকে পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত বিশেষভাবে নির্মিত সরঞ্জাম। বাংলাদেশে প্রায় ৭৫.৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচযোগ্য, কিন্তু দেখা যায় প্রাপ্ত পানিসম্পদের হিসাবে ৬৮ লক্ষ হেক্টরে সেচ দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে ৩১.২ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আছে। তবে আরও অতিরিক্ত ৩৬.৮ লক্ষ হেক্টর বৃষ্টিনির্ভর জমিতেও সেচ দেওয়া যাবে। ভূগর্ভস্থ পানির সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৪৫-৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা যায়।

বাংলাদেশে সেচকৃত জমির ৯৪ শতাংশই ক্ষুদ্র ও গৌণ সেচপ্রকল্পের অধীন। সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে, দেশে ২৬,৭০৪টি গভীর নলকূপ, ৪,৪৯,২২৬টি অগভীর নলকূপ, ৫৬,৮২৯টি সাধারণ নলকূপ, ১,৪২,১৩২টি হস্তচালিত নলকূপ ও ৫,৬৫,০০০টি দেশীয় সেচযন্ত্র দিয়ে সেচকার্য চলছে।

পানি উত্তোলনের জন্য আমাদের আছে সুপ্রাচীন দেশীয় পদ্ধতি থেকে সুদক্ষ অত্যাধুনিক পাম্প। বড় ধরনের সবগুলি সেচপ্রকল্পেই বৈদ্যুতিক মোটর বা ইঞ্জিন দিয়ে পাম্প চালানো হয়, কেননা যান্ত্রিকভাবে শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহারে অধিক উৎপাদন ও উচ্চতর দক্ষতার স্তর সহজেই অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পাম্প নির্বাচন পানির উৎস ও সেচযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, পানি তোলার পরিমাণ, পানির স্তরের গভীরতা, কী ধরনের ও কী পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি লভ্য, কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করে উত্তোলক যন্ত্র নির্বাচন করতে হবে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রগুলি মোটামুটি দুই রকম: মোটরচালিত পাম্প এবং হস্তচালিত পাম্প।

মোটরচালিত পাম্প গভীর নলকূপ সেচ ও গৃহকাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি তোলায় ব্যবহৃত সর্ববৃহৎ সেচযন্ত্র। সাধারণত কূপের গভীরতা ৬০-৯০ মিটার (২০০-৩০০ ফুট), ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি ২০-৩০ এবং পানি তোলার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ৫৬-৮৪ লিটার (২-৩ কিউসেক)। নলের ব্যাস ১৫-২৫ সেন্টিমিটার (৬-১০ ইঞ্চি)। এতে পানি তোলার জন্য টার্বাইন পাম্প ব্যবহৃত হয়। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর চোষণ-সীমা (suction head) অতিক্রম করলেও চালানো যায়।

অগভীর নলকূপ

অগভীর নলকূপ অপেক্ষাকৃত ছোট জমির সেচ কার্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কূপের গভীরতা ৩০ মিটারের (১০০ ফুট) কম, ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি ৪-৮ এবং পানি তোলার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ২৮ লিটারের (১ কিউসেক) কম। নলের ব্যাস ১০-১২ সেন্টিমিটার (৪-৫ ইঞ্চি)। বাংলাদেশে বর্তমানে অগভীর নলকূপ বিপুল সংখ্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণ নলকূপ ভূপৃষ্ঠের পানি পাম্প করে সেচপ্রদানে ব্যবহৃত হয়। অগভীর নলকূপের তুলনায় এটি অধিক শক্তিশালী। এই পদ্ধতি কেন্দ্রাতিগ পাম্পও ব্যবহার করে, তবে উৎসের পানির স্তর চোষণ-সীমা অতিক্রম করলে তা চালানো যায় না।

হস্তচালিত পাম্প দোন একমুখ বন্ধ ও অন্যমুখ খোলা কিস্তি আকৃতির কাঠের যন্ত্র। বন্ধমুখ কাঠের লম্বা দন্ডের সঙ্গে কষে রশি দিয়ে বাঁধা, যা খুঁটিতে লিভার হিসেবে ঘোরে। লিভারের খাটো প্রান্তে একটি বড় পাথরখন্ড বা শুকনো মাটির পিন্ড বেঁধে রাখা হয়। পানি নিষ্কাশনের খোলামুখ দেখতে নৌকার গলুইয়ের মতো। শরীরের ওজন দিয়ে দোন পানিতে ডুবানোর পর ছেড়ে দিলে লিভার এটাকে টেনে তোলে, ফলে দোনের মধ্যে উঠে আসা পানি সরাসরি জমিতে চলে যায়।

সনাতন সেচযন্ত্র: দোন

এই কৌশলে সেচের খরচ কম। দোন প্রায় ২.৪-৩.৬ মিটার (৮-১২ ফুট) লম্বা এবং ০.৯-১.২ মিটার (৩-৪ ফুট) পর্যন্ত গভীরতা থেকে পানি তুলতে পারে। এটি একজন লোক দিয়ে চালানো যায়। চালকের শক্তির ওপর পানি তোলার পরিমাণ নির্ভর করে। ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের ছোট জমিতে ভূপৃষ্ঠের পানির উৎস থেকে সেচের জন্য দোন উপযোগী।

দোলনা সেচনি পানি উত্তোলনের একটি প্রাচীন কৌশল। এতে হাতাওয়ালা একটি ঝুড়ি বা বেলচার মতো সেচনিতে ৪টি রশি বাঁধা থাকে। দুজন লোক মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকে দুই হাতে ঝুড়ির এক পাশের দুটি রশি ধরে। উভয়ে একই সময়ে সেচনি দুলিয়ে পানি ভরে এবং তা টেনে তুলে জমিতে পানি সেচে দেয়। যন্ত্রটি বাঁশ বা পাতলা টিনের তৈরি, বানানো সহজ এবং চালাতে তেমন কোন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না। এটি দিয়ে জলাশয়ের ও শস্যক্ষেতের ০.৯-১.২ মিটার (৩-৪ ফুট) নিচ থেকে সেচ দেওয়া যায়। পরিবারের মহিলা এবং অল্পবয়সীরাও যন্ত্রটি চালাতে পারে।

সনাতন সেচযন্ত্র: দোলনা সেচনি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডায়াফ্রাম পাম্প কিছু রাবারের ফালি দিয়ে সিল করা ধাতু নির্মিত বায়ুরোধী দুটি বাক্স, যা বায়ুশূন্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে। এটি চালাতে দুজন লোক লাগে। ভূপৃষ্ঠের ও কিছুটা নিচের পানি প্রতি মিনিটে ৮০ গ্যালন পর্যন্ত তোলা যায়।

দাঁড়-পাম্প ভিতরে পিস্টনসহ একটি ধাতু নির্মিত নলে তৈরি। যন্ত্রটি হস্তচালিত নলকূপের মতো। এটি মাটির উপর হেলিয়ে বসানো হয় এবং পানি তুলতে চালক দুটি হাতই ব্যবহার করে। চোষণ-সীমা অতিক্রান্ত না হলে এটি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের ও কিছুটা নিচের পানি উঠানো যায়। পানি পাম্প করার জন্য একজন লোকই যথেষ্ট। হস্তচালিত নলকূপ থেকে এটি কিছুটা সস্তা।

পা-চালিত পাম্প পানির স্তর চোষণ-সীমার মধ্যে থাকলে এটি দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি তোলা যায়। পানি তোলার ক্ষমতা হস্তচালিত নলকূপের অনুরূপ। চালক পা দিয়ে পাম্প চালায়। হস্তচালিত পাম্প থেকে এর খরচ কম।

বারি ডায়াফ্রাম পাম্প

হস্তচালিত পাম্প সাধারণত গৃহকাজে ব্যবহৃত হয়, তবে এ পাম্প দিয়ে জমিতেও সেচ দেওয়া যায়। চালকের শক্তির ওপর পানি তোলার পরিমাণ নির্ভর করে। চোষণ-সীমার মধ্যে থাকলে ভূগর্ভস্থ পানিও তোলা যায়।

হস্তচালিত ঝারি সচ্ছিদ্র নোজলসহ হালকা ধাতুর একটি পাত্র। পাত্রে পানি ভরে শস্যের উপরে নোজল দিয়ে পানি ছিটানো হয়। এটি সাধারণত আঙিনার ছোট বাগানে ব্যবহৃত হয়।

গামলা ৩০ থেকে ৬০ সেমি (১-২ ফুট) গভীরতা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত ধাতু নির্মিত হালকা থালার মতো একটি যন্ত্র। এটি হালকা সেচে ব্যবহৃত হয়, তবে খুবই শ্রমসাধ্য। এটি দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের পানিই তোলা যায় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকায় সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। [মো. আবদুর রশিদ]

সেচপদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যবহৃত সেচপদ্ধতিগুলি সাধারণ নিম্নরূপ:

জলাধার পদ্ধতি ধানচাষের জন্য এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে জমির এক পাশ থেকে পানি সরবরাহ করে সমস্ত জমি ৫-৭ সেমি স্থির পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে সফল সেচের জন্য সমতল ভূমির প্রয়োজন।

সীমানা পদ্ধতি কিছুটা ঢালু জমির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। এতে পানি ধরে রাখার জন্য এবং নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা রোধের জন্য গোটা মাঠে কিছুদূর পরপর মজবুত বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

খাঁজ পদ্ধতি সারিবদ্ধ রোপা ফসল যেমন ইক্ষু, আলু ইত্যাদির জন্য এই পদ্ধতি উপযুক্ত। লাইনের মধ্যে খাঁজ বরাবর পানি সরবরাহ করতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ছিটানো পদ্ধতি উঁচু-নিচু ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য উপযোগী। পানিখরচ কম বিধায় নরম মাটির ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি উত্তম। এই পদ্ধতিতে নলের মুখে আটকানো নজলের সাহায্যে বৃষ্টির মতো ঝিরঝিরে ধারায় পানি ছিটানো হয়। [মো. আবদুর রশিদ]

সেচের পৌনঃপুনিকতা শস্য উৎপাদনে সহায়তার জন্য জমিতে কৃত্রিমভাবে প্রদত্ত সেচের পুনরাবৃত্তি। দানাশস্যের গাছ অস্থায়িভাবে নেতিয়ে পড়লে ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বোঝায়। শস্যের পাতা দেখেও পানির চাহিদা বোঝা যায়। কিন্তু মাটির আর্দ্রতার মাত্রা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সেচের সময় নির্ধারণ বাঞ্ছনীয়। মাঠে উৎপন্ন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শস্যের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সেচের সময় ও পৌনঃপুনিকতা (frequency) বিষয়ে কিছু সুপারিশ প্রদান করেছে।

ধান ক্ষেতে সর্বক্ষণ পানি থাকা ধানের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। চারা রোপণের পর থেকে মাটি পানিসম্পৃক্ত থাকলে ভাল ফসল ফলে। চারা রোপণের ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত মাঠ পানিসম্পৃক্ত থাকলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কুশি (tiller) জন্মায়। দাঁড়ানো পানি সরে যাওয়ার পর প্রতিবার সেচের বিরতিতে মাঠ তিন দিন শুকনো থাকলে ধান উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে না। চারা রোপণের পরপর এবং ফুল আসার সময় ধানে সর্বাধিক পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়। ভাল ফলন পেতে এসময়ে মাঠে যথেষ্ট পানির ব্যবস্থা রাখা উচিত। ধানের জন্য একক অতিরিক্ত সেচ অত্যাবশ্যক নয়। ঘন ঘন স্বল্প পরিমাণ সেচই উত্তম। প্রতিবার সেচ দেওয়ার পর মাঠে পানির গভীরতা ৫-৭ সেমি থাকা বাঞ্ছনীয়। মাটি থেকে দৈনিক উবে-যাওয়া পানির পরিমাণ দিয়ে সেচের গভীরতাকে ভাগ করে সেচের পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণ করা যায়।

আউশ ও রোপা আমন বৃদ্ধির চরম (critical) পর্যায়ে, বিশেষত খরা হলে, অপেক্ষাকৃত অধিক ফলনের জন্য সম্পূরক সেচ দেওয়া ভাল। সাধারণত একবারে ৬০ মিমি-এর কাছাকাছি গভীর সেচ দিলে আমনের ফলন বাড়ে। সেচ সুবিধা না থাকলে বৃষ্টির পানি সংগ্রহে রেখে সম্পূরক সেচ দেওয়া যায়। মাঠের এক কোণে চাষ জমির ৫ শতাংশে ২ মিটার গভীর গর্ত খুঁড়ে যথেষ্ট পরিমাণ (৬০ মিমি পর্যন্ত) বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়। সম্পূরক সেচদান সম্ভব হলে যথাসময়ে আউশ ধানও চাষ করা চলে। নির্দিষ্ট সময়ে আমন রোপণেও এই কূপ কাজে লাগতে পারে।

গম অপেক্ষাকৃত উচ্চফলনের জন্য গম-ক্ষেতে সাধারণত ২-৩ বার সেচের প্রয়োজন হতে পারে। জলবায়ু ও মাটির ধরনের ভিত্তিতে স্থানভেদে সেচের প্রয়োজন ভিন্ন হয়ে থাকে। বীজ বপনের (গুচ্ছমূল উদ্গমের প্রাক্কালে) ১৭-২১ দিন পর গমে প্রথম সেচ দেওয়া প্রয়োজন। মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকলে বিলম্বেও সেচ দেওয়া চলে। গমের শিষ বেরনো ও দানা গঠনের সময় সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বীজ বপনের ৪০-৪৫ ও ৭০-৭৫ দিন পর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সেচদান আবশ্যক। প্রতিবার প্রদত্ত সেচে পানির গভীরতা ৬-৮ সেমি হওয়া ভাল।

আলু আলুর উচ্চফলনের জন্য সেচপ্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক অবস্থায় মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে গাছ প্রতি আলুর ফলন হ্রাস পায়। আর্দ্রতা শেষ পর্যায় পর্যন্ত স্থায়ী হলে দানার আকার ছোট ও অসমান হয়। বীজ রোপণের ২০-২৫, ৪০-৪৫ ও ৬০-৬৫ দিন পর যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে সেচপ্রদান উচিত।

ভুট্টা ভাল উৎপাদনের জন্য সাধারণত ৪-৫ বার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের ১৫-২০, ৩০-৩৫, ৬০-৭০ ও ৮৫-৯৫ দিন পর যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতে সেচপ্রদান উচিত। প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ে সেচে পানির গভীরতা যথাক্রমে ৬-৮ ও ৮-১০ সেমি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফুল আসা ও দানা গঠন পর্যায়ে জমিতে *দাঁড়ানো পানি অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে।*

আখ ফসল বৃদ্ধির ৫-৭ মাসের সময় সেচপ্রদান আবশ্যক, কেননা তখন পানির প্রয়োজন সর্বাধিক। সচরাচর ৫-৬ বার সেচ দিতে হয়। ফুল আসার পর সেচপ্রদান নিষ্প্রয়োজন। এই পর্যায়ের পর জমি শুকনো থাকলে ফসলে শর্করার পরিমাণ বাড়ে।

সরিষা সঠিক সময়ে সেচ দিলে সরিষার ফলন বাড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুবার সেচে আশানুরূপ ফলন ফলে, কিন্তু স্থান ও সরিষার জাতভেদে ১-৩ বার সেচ দিতে হতে পারে। বীজ বপনের ২৫-৩০ ও ৫০-৫৫ দিন পর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে সেচপ্রদান উচিত। অঙ্কুরোদ্গমের সময় মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ উপকারী।

পিঁয়াজ উত্তম ফলনের জন্য পিঁয়াজে ঘন ঘন স্বল্প পরিমাণ সেচ প্রদান ভাল। চারা রোপণের পর ১-২ বার সেচ দিতে হয়। তারপর ১০-১৫ দিন পরপর গোটা বৃদ্ধিকালে ৪-৫ বার হালকা সেচপ্রদান আবশ্যক। সেচে প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ে পানির গভীরতা যথাক্রমে ২-৩ ও ৩-৪ সেমি হওয়া ভাল। জমিতে দাঁড়ানো পানি পিঁয়াজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

টমেটো টমেটোর জন্য সেচ প্রদান অপরিহার্য। সঠিক সেচ দিলে রবি মরসুমে ফলন ২-৩ গুণ বাড়ে। চারা রোপণের শুরুতে প্রতিদিন সেচ প্রদান আবশ্যক। পরে ক্রমে ৩-৪ দিন থেকে ১০-১২ দিনের বিরতিতে সেচ প্রদান চলে। প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ে সেচে পানির গভীরতা যথাক্রমে ৩-৪ ও ৪-৬ সেমি হওয়া উচিত। [মো. আবদুর রশিদ]

সেচের পানি ব্যবস্থাপনা ফসলের ক্ষেতে সঠিক নিয়ন্ত্রণসহ সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সরবরাহকরণ। বাংলাদেশে ষাটের দশকের শুরু থেকে গভীর নলকূপ এবং লো-লিফট পাম্প (low-lift pump)-এর সাহায্যে সেচকার্য শুরু হয়েছিল। এর পূর্বে কৃষকরা বৃষ্টির পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করত। ১৯৮০ সালের পর সেচ কার্যক্রমে অগভীর নলকূপের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশের রয়েছে প্রায় ১৪৪ লক্ষ হেক্টর জমি, যার মধ্যে ৯০.৩ লক্ষ হেক্টর (৬৪%) চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬১% আবাদযোগ্য জমিতে (৫৫.০ লক্ষ হেক্টর) সেচ সুবিধা রয়েছে।

বাংলাদেশে সেচব্যবস্থা ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপবিক পরিবর্তন এনেছে। ধান ব্যতিরেকে অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও সীমিত আকারে সেচ ব্যবহৃত হচ্ছে। সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির ৯০-৯৫% এককভাবে দখল করে আছে ধান এবং অবশিষ্ট মাত্র ৫-১০% জমি রয়েছে বাদবাকি শস্যের জন্য। বোরো মৌসুমে (গমের বিকল্প ফসল) আধুনিক জাতের (Modern Variety-MV) ধান চাষ প্রায় সম্পূর্ণরূপে সেচের পানির ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক জাতের বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও অল্পমাত্রার সেচব্যবস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে আউশ এবং রোপা আমনের ক্ষেত্রেও সেচ ব্যবস্থার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। আউশ ধানের প্রথম দিকে এবং রোপা আমন ধানের শেষ দিকে কোন কোন মৌসুমে এই ফসলগুলি পানির অভাবজনিত সমস্যায় পড়ে। তাই এই দুটি পর্যায়ে সম্পূরক সেচ আধুনিক জাতের ধান চাষকে উৎসাহিত করবে এবং ফসলের স্থায়ী ও উন্নততর ফলন নিশ্চিত করবে। গম, জোয়ার এবং আলুর মতো কিছু কিছু নির্বাচিত ফসল মৃত্তিকায় অবশিষ্ট আর্দ্রতায় উৎপন্ন করা যায়, তবে এক অথবা দুইবার সেচ প্রয়োগ করা হলে এসব ফসলের ফলন প্রচুর পরিমাণে বাড়তে পারে।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশে সেচের পানি পরিমিতভাবে ব্যবহার করার কাজটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই পানির ফলপ্রসূ ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজন সারা বছরব্যাপী লভ্য সেচ সুবিধার সদ্ব্যবহার করা।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এদেশে প্রায় ৯৫% বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং শীতকালীন মাসগুলি, যেমন নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত থাকে বেশ শুষ্ক। এ কারণে নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্চফলন লাভ করার জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচ প্রয়োগ করা হলো একটি পূর্বশর্ত। জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আউশ ও আমন ধানের জন্য অনাবৃষ্টির সময়েও সম্পূরক সেচের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

সেচের পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে এর খরচ। অতএব বহুব্যয়সাপেক্ষ এই উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান হতে হবে, যাতে এর অপচয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে। সেচের পানির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে একই পরিমাণ পানির সাহায্যে আরও অধিক পরিমাণ জমিতে সেচকার্য চালানো যেতে পারে। যদি সেচের পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করা যায়, তাহলে উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবাদ কিম্বা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণের জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ কারণে সেচ ব্যবস্থা এবং ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সংশিষ্টদের মধ্যে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য দরকার দক্ষতার সঙ্গে লভ্য পানির সদ্ব্যবহার করা। সেচ সুবিধাগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করার জন্য জ্বালানি, তেল এবং সেচ উপকরণের ক্রমবর্ধমান মূল্য সেচের পানির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের দাবি রাখে। সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করার জন্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্তিকা, উদ্ভিদ এবং পানির সম্পর্ককে যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। [মো. আবদুর রশিদ]

কমমাত্রার সেচ (Minor irrigation) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফসলি জমিতে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ পানি সরবরাহ পদ্ধতি। বাংলাদেশ পানি সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও বাৎসরিক চক্রে শুকনো মৌসুমে অনেক সময়েই পানির ঘাটতি দেখা যায়। আবার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে অনেক ক্ষেত্রে পানি সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তথাপি এসব প্রকল্প থেকে এখনও আশানুরূপ ফলাফল অর্জিত হয় নি। এ কারণে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে কমমাত্রার সেচ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চালু করতে হয়েছে। এ কার্যক্রমকে অনেক সময়ে ‘দ্রুত ফলদায়ক প্রযুক্তি’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব প্রযুক্তির

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেচের জন্য সাধারণ নলকূপ, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ট্রিডল পাম্প (Treadle pump), রোয়ার পাম্প (Rower pump), ফ্লোটিং পাম্প (Floating pump) ইত্যাদি। স্থানীয় অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন দোলনা সেচনি, দোন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জলাশয় থেকে কমমাত্রার সেচ কাজে দেশের প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়।

ছোটখাটো সেচ সুবিধা শস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট প্রায় ৯০ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর আবাদযোগ্য ভূমির প্রায় ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর সেচের আওতায় আনার উপযোগী। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে মোট ৩১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর সেচকৃত জমির মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ ছিল কমমাত্রার সেচের আওতায়।

স্বাধীনতার পর থেকেই কমমাত্রার সেচ শস্যের উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব হয়েছে। সেচকার্য ফসল উৎপাদনে ঘাটতি হবার ঝুঁকি কমায় এবং উন্নতজাতের ফসল চাষের সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে গ্রামীণ লোকদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। [মো. জাহিদুল ইসলাম]